বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।*
[Discuss the Powers and Functions of the Supreme Court.]

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সুপ্রিমকোর্টের অবস্থান— ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষে। সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এই কার্যাবলি হল—

(ক) মূল এলাকা সংক্রান্ত কাজ,
(খ) আপিল এলাকা সংক্রান্ত কাজ,
(গ) পরামর্শদান এলাকা সংক্রান্ত কাজ এবং
(ঘ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারির এলাকা সংক্রান্ত কাজ।

(ক) মূল এলাকা (Original Jurisdiction)-সংক্রান্ত কাজ : সংবিধানের ১৩১নং ধারা অনুসারে যদি আইনগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দেয়, অথবা, কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, অথবা, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সেইসব বিরোধ মীমাংসার জন্য মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করা যায়। এইরূপ বিরোধ মীমাংসার সময়

সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা দেয় বলে এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টকে বলা হয় 'সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা'।

● **বাধানিষেধ :** সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা সংক্রান্ত কাজ অবাধ নয়। এক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যেসব সন্ধি, চুক্তি, সনদ বা অঙ্গীকারপত্র সংবিধান চালু হবার আগে করা হয়েছিল বা প্রয়োগ করা হয়েছিল, অথচ সংবিধান চালু হবার পরও তা কার্যকর আছে, সেইসব ক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না। আবার উল্লেখিত ওইসব বিষয়গুলির ব্যাপারে যদি এও বলা থাকে যে, সুপ্রিমকোর্ট এইসব বিরোধের ক্ষেত্র পর্যন্ত এলাকা সম্প্রসারণ করতে পারবে না, তাহলে সেইসব বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যদি রাষ্ট্রপতি ওইসব বিরোধের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শ চান, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে বাধ্য। তবে সুপ্রিমকোর্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দিলেও রাষ্ট্রপতি ওই পরামর্শমতো কাজ নাও করতে পারেন।

● **নির্বাচন-বিষয়ক বিরোধ মীমাংসা :** সংবিধানের ৭১(১)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় বা বিরোধ বাধে, তাহলে সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা দ্বারা তা নিষ্পত্তি করা হয়। সুপ্রিমকোর্ট এক্ষেত্রে যে রায় দেয়, তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(খ) আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction)-সংক্রান্ত কাজ : ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আপিল আদালত হল ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। সংবিধানের ১৩২—১৩৪নং ধারায় আপিল-সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) সংবিধানের ব্যাখ্যাবিষয়ক আপিল,
(২) দেওয়ানি আপিল,
(৩) ফৌজদারি আপিল এবং
(৪) বিশেষ অনুমতিসম্পন্ন আপিল।

(১) সংবিধানের ব্যাখ্যাবিষয়ক আপিল : সংবিধানের ১৩২নং ধারা অনুসারে যদি কোনো হাইকোর্ট দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য যে-কোনো মামলা বিষয়ে এইরূপ কোনো সার্টিফিকেট দেয়, যাতে বলা থাকে যে, ওই মামলার সঙ্গে 'সংবিধানের ব্যাখ্যাবিষয়ক' গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে সেইসব মামলার বিচারের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যাবে। তবে হাইকোর্ট যদি বিশেষ কোনো ব্যাপারে এইরূপ সার্টিফিকেট দিতে না-চায়, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট নিজেই সে ব্যাপারে আপিলের অনুমতি দিতে পারে।

(২) দেওয়ানি আপিল : হাইকোর্ট যদি এমন কোনো সার্টিফিকেট দেয়, যাতে উল্লেখ থাকে যে, দেওয়ানি মামলাটির সঙ্গে আইনসংগত সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহলে সুপ্রিমকোর্টে তা আপিলযোগ্য হবে। আবার হাইকোর্ট যদি এও মনে করে যে, সুপ্রিমকোর্টে কোনো দেওয়ানি মামলার বিচার করা উচিত, তাহলে সুপ্রিমকোর্টে সেই মামলা সম্পর্কে আপিল করা যেতে পারে।

(৩) ফৌজদারি আপিল : সংবিধানের ১৩৪নং ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করা যেতে পারে। এবিষয়ে তিন প্রকারের মামলার উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

(ক) নিম্ন আদালত নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছে, এমন কাউকে যদি হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড দেয়;

(খ) নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলাকে হাইকোর্ট নিজ অধীনে এনে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে;

(গ) 'সুপ্রিমকোর্টে মামলাটি আবেদনযোগ্য'— এই মর্মে যদি হাইকোর্ট কোনো মামলায় সার্টিফিকেট দেয়।

উল্লেখযোগ্য যে, নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদ ইচ্ছা করলে আপিল এলাকার প্রসারণ ঘটাতে পারে।

(৪) বিশেষ অনুমতিসম্পন্ন আপিল : সংবিধানের ১৩৬নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট যদি মনে করে, তাহলে ভারতে অবস্থিত যে-কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যে-কোনো রায়, আদেশ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। তবে ১৩৬(২)নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট কোনো সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতিদানে অপারগ।

(গ) পরামর্শদান (Advisory Jurisdiction)-সংক্রান্ত কাজ : সংবিধানের ১৪৩(১) নং ধারা অনুসারে, আইন বা তথ্য-বিষয়ক সার্বিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহলে সুপ্রিমকোর্টের কাছে তিনি সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে সুপ্রিমকোর্ট এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে আবার না-ও দিতে পারে।

সংবিধানের ১৪৩(২)নং ধারা অনুসারে সন্ধি, চুক্তি, সনদ বা অঙ্গীকারপত্র প্রভৃতি যেগুলি সংবিধান প্রচলিত হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং এখনও তা কার্যকর আছে, সেইসব বিষয়ে যদি কোনো বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে সে ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ রাষ্ট্রপতি নিতে পারেন। এ-ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য। তবে রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন, আবার না-ও করতে পারেন।

(ঘ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারির এলাকা (Jurisdiction to issue Directions, Orders and Writs)-সংক্রান্ত কাজ : নাগরিকরা মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট পাঁচটি লেখ জারি করতে পারে। এগুলি হল—

(১) বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, (২) পরমাদেশ, (৩) প্রতিষেধ, (৪) উৎপ্রেষণ, (৫) অধিকার-পৃচ্ছা।

তবে উল্লেখযোগ্য যে, জরুরি অবস্থা চালু থাকাকালীন সময়ে সুপ্রিমকোর্টের কাছে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার আবেদন রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে খর্ব করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের কোনো ভূমিকা থাকে না।

এইসব কাজ ছাড়াও সুপ্রিমকোর্ট আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যেমন—

(ক) সুপ্রিমকোর্ট অভিলেখ আদালত হিসাবে কাজ করে।

(খ) আদালত অবমাননার জন্য তদন্ত করতে পারে এবং শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা করে।

(গ) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যাপারে মামলার নিষ্পত্তি করে।

(ঘ) সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কাজ করে।

(ঙ) সুপ্রিমকোর্ট বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার কাজ করে।

(চ) নিজ বিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করে প্রভৃতি।

■ **মূল্যায়ন :**

সুপ্রিমকোর্ট হল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তা ছাড়া দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা এবং সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা গেছে যে, সুপ্রিমকোর্টের কখনো-কখনো নেতিবাচক ভূমিকা সমাজপরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেমন— ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বা রাজন্যভাতা বিলোপ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করায় প্রগতির ভাবধারার পক্ষে তা সন্তোষজনক ছিল না।

তবে এ কথা ঠিক যে, দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা-বিষয়ক মামলায় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট প্রশংসনীয় সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে। শুধুমাত্র সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সুপ্রিমকোর্টে যে-কোনো আদালত ও ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। তুলনামূলক বিচারে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট এ-ব্যাপারে এত ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করে না।

সর্বোপরি বলা যায় যে, ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট বর্তমানে যেভাবে কাজ করছে, তাতে তার 'Judicial Activism' (বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা)-এর বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। যা আগে সুপ্রিমকোর্ট সম্পর্কে যেসব ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সার্বিক বিচারে ভারতের বিচারবিভাগ— ব্রিটেনের বিচারবিভাগ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের মধ্যস্থানবর্তী।

প্রশ্ন : ২। বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে কী বোঝায়? সমালোচনাসহ ভারতের বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বিশ্লেষণ করো।
[What is meant by Judicial Activism ? Critically analyse the judicial activism in India.]

উত্তর। বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা

যখন উচ্চ আদালতসমূহ, বিশেষত সুপ্রিমকোর্ট সংবিধান প্রদত্ত এক্তিয়ার-বর্হিভূতভাবে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ারের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাকে বলে 'বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা' বা Judicial Activism। প্রাক্তন বিচারপতি পি.বি. সাওয়ান্ত বলেছেন যে, বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে বিচারবিভাগের সেইসব কাজকে বোঝায়, যার দ্বারা বিচারবিভাগ আইন ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ারে প্রবেশ করে।

● **বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বিশ্লেষণ :**

বিচারব্যবস্থা কার্যত সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে সংবিধানের কোনো ধারার ব্যাখ্যাপ্রদান বা নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো সংরক্ষিত করার ব্যাপারে আদালত তার দায়িত্ব বহন করে। দেশের মৌলিক কাঠামো যদি কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা কোনোদিক থেকে বাধার সম্মুখীন হয়, তাহলে জনস্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। নিপীড়িত জনগণ সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। তাই, নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে তথা জনস্বার্থে ন্যায়বিচার হয়ে ওঠে বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে এরই ভিত্তিতে।

বিচারবিভাগের সক্রিয়তা বলতে তাই বিচারবিভাগের এমন কিছু বিশেষ ক্ষমতাকে বোঝায়, যার দ্বারা বিচারবিভাগ আইন ও শাসনবিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে এই ক্ষমতাবলে বিচারবিভাগ নির্দেশ দিতে পারে। এ ছাড়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের তদারকির কাজও আদালত করতে পারে। তাই সর্বোচ্চ আদালতের নিকট থেকে যখন আইন ও শাসনবিভাগের কাজের ওপর কোনো রায় প্রকাশ পায়, তখন তা আরও উদ্দীপ্ত আকার ধারণ করে।

বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা দেখা দিতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধারণাটি গড়ে ওঠেনি। বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে আদালত কতকগুলি আবেদনের সম্মুখীন হয়। যেমন— রাজনীতিকে দুর্নীতি ও কলুষমুক্ত করা, পরিবেশ-দূষণ বুখবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা বা মহামারি নিবারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে আদালত— সরকারি সংস্থাগুলির ওপর নির্দেশ জারি করে। অর্থাৎ, জনস্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি রক্ষার জন্য বিচারবিভাগ সরকার ও সরকারি বিভাগগুলিকে প্রভাবিত করে। এইভাবে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা কার্যকর হয়ে ওঠে।

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা সৃষ্টির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যে, সুষ্ঠু চিন্তাসম্পন্ন ও মানবতাবাদী বিবেকবান বহু মানুষ আদালতের কাছে সরকারি ব্যবস্থা তথা আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা সমসুযোগের জন্য আবেদন করেন। আদালত এইসব আবেদন স্বীকার করে; কারণ, তারা চায় মানুষকে ন্যায়বিচার প্রদান করে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার গড়ে উঠুক। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার গড়ে না-তুললে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিপীড়িত মানুষেরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে, ফলে জনস্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে। কার্যত আদালত মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ করতে গিয়ে এরই আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে যেসব কাজ করতে শুরু করে, তাই বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা হিসাবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ, বিচারবিভাগ তার Activism-এর দ্বারা ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বিষয়টির ওপর সুবিচার আরোপের চেষ্টা করে। যার দ্বারা জনস্বার্থ-বিপন্নতার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। অর্থাৎ, বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা দ্বারা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়।

বিচারবিভাগের কাজ হল সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অনুশাসনের এক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয় বিচারবিভাগকে। এই কাজ করতে গিয়ে বিচারবিভাগ নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, যাতে সমাজের নিপীড়িত মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না-হয়। ন্যায়ের পক্ষে, নির্ভীক ও নিঃশঙ্কভাবে যখন বিচারবিভাগ কাজ করে এবং এ-ব্যাপারে প্রয়োজন হলে আইন ও প্রশাসনের কার্যধারার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাকে Judicial Activism বা বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলে উল্লেখ করা হয়।

তবে বিচারবিভাগ সংবিধানের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই তার কাজ করে থাকে। যেমন— সংসদ দ্বারা প্রণীত কোনো আইন বা শাসনবিভাগীয় কোনো কাজ যদি সংবিধান-বিরোধী হয়, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট তা বিচার করে দেখে। আবার সংবিধানের ১৩(২) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র যদি এমন কোনো আইন প্রণয়ন করে, যা সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত অধিকারগুলিকে ল ন করে, তাহলে সংবিধানবিরোধী বলে সেই আইন বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার কোনো ক্ষমতা আদালতের হাতে তুলে না-দিলেও বাস্তবে বিচারবিভাগ সংবিধানবিরোধী আইন বাতিল করতে গিয়ে এবং সংবিধানের

তৃতীয় অংশে বর্ণিত অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে গিয়ে কার্যত Judicial Activism-ই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা প্রকাশ পায় দু-ধরনের মামলার মাধ্যমে। যথা— (ক) Public Interest Litigation বা জনস্বার্থমূলক মামলা— এর দ্বারা কোনো ব্যক্তিস্বার্থ-সমন্বিত মামলার বিষয়বস্তু বিবেচ্য নয়, এর বিবেচ্য বিষয়বস্তু হল জনগণের স্বার্থ-সমন্বিত বিষয়। একে প্রাক্তন বিচারপতি পি.এন. ভগবতী বলেছেন, জনস্বার্থ-সমন্বিত মামলা আসলে আইনগত সাহায্য দ্বারা পরিচালিত একটি আন্দোলনের কৌশল। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো ও তাদের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠা দ্বারা তা বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ Public Interest Litigation-এর উদ্দেশ্য হল— অর্থ ও সহায়সম্বলহীন শোষিত মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের দুয়ার খুলে দেওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি চিঠির মাধ্যমে আদালতে জনস্বার্থ বিষয়ে আবেদন করে অথবা খবরের কাগজে প্রকাশিত কোনো খবরে যদি জনস্বার্থ-বিষয়ক এরূপ কোনো খবর প্রকাশ করে, যাতে মনে করা হয় যে, জনস্বার্থ বিপন্ন হয়েছে, তাহলে এরূপ মামলা হতে পারে। (খ) Social Action Litigation বা সামাজিক ক্রিয়ামূলক মামলা— এর দ্বারা জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই বিচারপতিরা নিজেরাই উদ্যোগ নেয়। জনস্বার্থমূলক মামলা অপেক্ষা সামাজিক ক্রিয়ামূলক মামলার ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য। তবে অনেকে মনে করেন যে, জনস্বার্থমূলক মামলার সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কিত মামলার কোনো পার্থক্য নেই। বিচারবিভাগীয় কর্মপদ্ধতিতে সংস্কারসাধন করাই হল এর অন্যতম লক্ষ্য। ভারতে সাম্প্রতিককালে বিচারবিভাগের অতি সক্রিয় হয়ে ওঠার অন্তরালে এই মামলা-দুটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

■ **সমালোচনা :**

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিচারবিভাগ তার কাজের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করে। গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বিচারবিভাগকে হতে হয় নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। গণতন্ত্র সার্থক রূপ নিতে পারে,

প্রশ্ন : ৪। *ভারতের কোনো একটি হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।*
[Discuss the powers and functions of any one of the High Court in India.]

উত্তর। হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং একাধিক রাজ্যের জন্যও একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হাইকোর্টের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। সংবিধানের ২২৬নং ধারায় এ-কথা বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট সংবিধান ও আইনের পরিধির মধ্যে থেকে তার কাজ করবে। হাইকোর্টের কাজের এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা—

(ক) মূল এলাকাভুক্ত কাজ :

হাইকোর্ট মূল এলাকায় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ, রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয় হাইকোর্টের মূল এলাকায়। উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা রাজস্ব-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টির বিলোপসাধন করা হয়েছিল। তবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৪৪তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা পুনরায় হাইকোর্টের হাতে এই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতা সকল হাইকোর্টের নেই। এই ক্ষমতার অধিকারী কেবলমাত্র তিনটি হাইকোর্ট। যথা— কলকাতা হাইকোর্ট, মুম্বাই হাইকোর্ট এবং চেন্নাই হাইকোর্ট। ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তনের (১৯৭৩) পর থেকে হাইকোর্টের ফৌজদারি মামলা বিষয়ক মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাই-এ City Session Court-এ ফৌজদারি মামলার বিচার হয়।

(খ) আপিল এলাকাভুক্ত কাজ :

রাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হল হাইকোর্ট। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আপিল-সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

(১) দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে ক্ষমতা : দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা হল—

প্রথমত, হাইকোর্টে জেলা জজ ও অন্য অধস্তন জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র আইন ও পথতিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে যদি ঊর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলার ক্ষেত্রে রায় দেয়, তাহলে হাইকোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, হাইকোর্টের একজন বিচারকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে।

(২) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ক্ষমতা : ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে—

প্রথমত, কোনো ব্যক্তিকে দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ যদি সাত বছরের বেশি কারাদণ্ড দেয়, তাহলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

দ্বিতীয়ত, আবার এমন কিছু সুনির্দিষ্ট মামলা আছে, যেখানে দায়রা জজ, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট যেসব রায় দেন, তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।

(গ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি সংক্রান্ত ক্ষমতা :

হাইকোর্ট রাজ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য Writ বা লেখ জারি করতে পারে। এই Writ-গুলি হল— (১) বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, (২) পরমাদেশ, (৩) প্রতিষেধ, (৪) অধিকার-পৃচ্ছা এবং (৫) উৎপ্রেষণ।

এ ছাড়া অপর যে-কোনো উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারির ক্ষমতা আছে; যা সুপ্রিমকোর্টের নেই। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪৩তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা হাইকোর্টের এই ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে মাত্র দুটি ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যথা—

(১) যদি বৈধ আইন লঙ্ঘিত হয়;

(২) যদি কোনো কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতিগত দিক থেকে ভুল কাজ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে, তাহলে হাইকোর্ট সে ব্যাপারে নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করতে পারে। অবশ্য ৪৪তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় অপর যে-কোনো উদ্দেশ্যে নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করতে পারে।

(ঘ) আইনের বৈধতা, বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা :

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা মূল সংবিধান অনুসারে হাইকোর্ট ভোগ করত; কিন্তু ৪২-তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা হাইকোর্টের এই ক্ষমতাকে বাতিল করে দেওয়া হয়। আবার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৪৩তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে পুনরায় হাইকোর্টকে এই ক্ষমতা দান করা হয়। বর্তমানে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য— যে-কোনো আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে।

(ঙ) অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধানমূলক ক্ষমতা :

এক্ষেত্রে হাইকোর্টের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল— (১) সামরিক ও ট্রাইব্যুনাল আদালত হাইকোর্ট অন্যান্য সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলির তত্ত্বাবধান করে থাকে। (২) সকল অধস্তন আদালতগুলিকে হাইকোর্ট যে-কোনো প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ জমা দেবার নির্দেশ দিতে পারে। (৩) তা ছাড়া হাইকোর্ট অধস্তন আদালতগুলির কর্মচারীদের নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কেও নির্দেশ দিতে পারে।

(চ) মামলা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষমতা :

হাইকোর্ট যদি মনে করে যে, নিম্নতন কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওই মামলাটি হাইকোর্ট নিজের হাতে তুলে নিতে পারে।

(ছ) অন্যান্য ক্ষমতা :

হাইকোর্টের অন্যান্য কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) অধস্তন আদালতগুলি হাইকোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধস্তন আদালতগুলির কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি হাইকোর্ট করে থাকে।

(২) রাজ্যপাল, জেলা জজের নিয়োগ, পদোন্নতি বা বদলি করার সময় হাইকোর্টের পরামর্শ নিয়ে থাকেন।

(৩) হাইকোর্ট Court of Record হিসাবে কাজ করে।

(৪) বিচারের জন্য হাইকোর্ট প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রস্তুত করে।

(৫) নিজ অবমাননার জন্য হাইকোর্ট অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারে।

(খ) বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি (১৯৫৯);

(গ) জম্মু-কাশ্মীর পুনর্বাসন বিল সংক্রান্ত বিষয় (১৯৮২) প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শদানমূলক এক্তিয়ার গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩। *ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য কী-কী ব্যবস্থা আছে?*

[What are the safeguards for the Independence and Impartiality of the Judiciary in India ?]

উত্তর। **বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা**

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা হল গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। বিচারব্যবস্থা যদি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হয়, তাহলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের অনুশাসন যথাযথ বজায় থাকে। ভারতে তাই সংবিধান-রচয়িতাগণ বিচারব্যবস্থাকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী হিসাবে গড়ে

তুলতে সচেষ্ট হন। বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে।

প্রথমত, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেও তিনি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও পরামর্শ করেন।

দ্বিতীয়ত, বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, 'অসদাচরণ' অথবা 'অযোগ্যতা'র কারণে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্যদের বেশিরভাগ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের কমপক্ষে ⅔-অংশ দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করেন।

তৃতীয়ত, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বেতন সংবিধান দ্বারা স্থিরীকৃত। উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন দ্বারা বিচারপতিদের ভাতা, ছুটি, বেতন নির্ধারণ করতে পারলেও তাঁদের কার্যকালীন সময়ের মধ্যে তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসমূহের ক্ষতিকরভাবে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু "আর্থিক জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করা হলে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বেতন রাষ্ট্রপতি কমিয়ে দিতে পারেন।

চতুর্থত, সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভারতের সঞ্চিত তহবিল' থেকে সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসনিক ব্যয়, বিচারকদের ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি দিতে হবে।

পঞ্চমত, কোনো বিচারপতির অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব জানানো ব্যতীত সুপ্রিমকোর্ট অথবা হাইকোর্টের কোনো বিচারপতির আচরণ সম্পর্কে পার্লামেন্টে আলোচনা করা যাবে না।

ষষ্ঠত, সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতি অবসর গ্রহণ করার পর ভারতের কোনো আদালতে পুনরায় আইনজীবীরূপে কাজ করতে পারবেন না।

প্রশ্ন . ৪। *'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' বলতে তুমি কী বোঝো?*
[What do you mean by 'Judicial Review'?]

উত্তর। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা

যদি কোনো আইন বা আদেশ বা নির্দেশ সংবিধানসম্মত না-হয়, তাহলে ওই আইন বা আদেশ বা নির্দেশকে অবৈধ বলে আদালত ঘোষণা করতে পারে। যেসব আইন বা আদেশ বা নির্দেশকে আদালত অবৈধ বলে ঘোষণা করে, সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হয়, অর্থাৎ, সেগুলি কার্যকর হয় না। সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতাকে বলা হয় 'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' বা 'Judicial Review'।

অধ্যাপক জোহারিকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, কোনো আইনকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার সময় দেখা হয় যে—

প্রথমত, আইনটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে কিনা। যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা প্রণীত না-হয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, আদালত বিচার করে দেখে আইনটি সম্পূর্ণভাবে না আংশিকভাবে সংবিধান-বিরোধী। যদি আইনটি আংশিকভাবে সংবিধানবিরোধী হয়, তাহলে কেবল অসংযত অংশটিই বাতিল হয়ে যাবে; আর, যদি পুরোপুরি তা সংবিধানবিরোধী হয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিরিখে আদালত আইনটির ব্যাখ্যা ও বিচার করে থাকে।

চতুর্থত, এইসময় আদালত সংবিধানের মূল প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আইনটির বিচার করে থাকে।

ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়নি, যার দ্বারা কোনো আদালত কোনো আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনার প্রতিটি বিভাগের ওপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে এবং কোনো আইন দ্বারা যদি ওইসব নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘিত হয়, তাহলে সেই আইনটি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং, সুপ্রিমকোর্ট বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধান রক্ষার কাজ করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, (ক) ব্যাংক জাতীয়করণ আইন (১৯৬৯), (খ) রাজন্যভাতা বিলোপ-বিষয়ক রাষ্ট্রপতির আদেশ (১৯৭০) প্রভৃতি 'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' দ্বারা বাতিল করা হয়।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *ভারতের বিচারব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতের বিচারব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য হল—

প্রথমত, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকলেও বিচারব্যবস্থা অখণ্ড। সুপ্রিমকোর্ট এই অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র দেশে একইপ্রকার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন দ্বারা বিচারের কাজ করা হয়।

প্রশ্ন : ২। *প্রথমে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা কত ছিল?*

উত্তর। প্রথমে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ছিল— ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৭ জন অন্যান্য বিচারপতি।

প্রশ্ন : ৩। *বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টে কতজন বিচারপতি আছেন?*

উত্তর। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ২৬ জন। এঁদের মধ্যে একজন প্রধান বিচারপতি এবং ২৫ জন অন্যান্য বিচারপতি।

প্রশ্ন : ৪। *সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য কী-কী যোগ্যতা থাকা দরকার?*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হতে গেলে যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন, তা হল—

(ক) তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

(খ) তাঁর কোনো হাইকোর্ট অথবা একাধিক হাইকোর্টে ৫ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) কোনো একটি বা একাধিক হাইকোর্টে ১০ বছর ব্যাপী অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঘ) কোনো বিচক্ষণ আইনবিদকে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৫। *কেন সুপ্রিমকোর্টকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে গণ্য করা হয়?*

উত্তর। কোনো যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যা, কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা, আইনের সাংবিধানিকতা বিচার, নাগরিক অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একজন অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সুপ্রিমকোর্ট এইসব দায়িত্ব পালন করে বলে ভারতে সুপ্রিমকোর্টকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন : ৬। *ভারতে বিচারব্যবস্থার কাঠামোটি উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতে বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রিমকোর্টের অবস্থান। আবার রাজ্যের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হল সর্বোচ্চ আদালত। গ্রাম পর্যায়ে, অর্থাৎ, সর্বনিম্নস্তরে আছে ন্যায় পঞ্চায়েত। এইভাবে ভারতের বিচারব্যবস্থার কাঠামোটি হল ক্রমস্তর বিন্যস্ত।

প্রশ্ন : ৭। *ভারতে বিচারব্যবস্থাকে কেন একটি সংহত বিচারব্যবস্থা বলা হয়?*

উত্তর। ভারতে বিচারব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট কাজ করে। রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের সকল আদালতের ওপর সুপ্রিমকোর্টের রায় বা সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। এই কারণে ভারতের বিচারব্যবস্থাকে একটি সংহত বিচারব্যবস্থা বলা যায়।

প্রশ্ন : ৮। *সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রগুলিকে কয়টি এলাকায় ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রগুলি চারটি এলাকায় বিভক্ত। যথা— (ক) মূল এলাকা, (খ) আপিল এলাকা, (গ) পরামর্শদান এলাকা এবং (ঘ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারির এলাকা।

প্রশ্ন : ৯। *সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যদি আইনগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দেয়, অথবা, কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দেয়, অথবা, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সেইসব বিরোধ মীমাংসার জন্য মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করা যায়।

প্রশ্ন : ১০। *সুপ্রিমকোর্ট কীভাবে মূল এলাকায় বিরোধের মীমাংসা করতে পারে?*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাপ্রদানের মাধ্যমে মূল এলাকায় সকল বিরোধের মীমাংসা করতে পারে।

প্রশ্ন : ১১। *সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার ওপর কীরূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে?*

উত্তর। যেসব সন্ধি, চুক্তি, সনদ বা অঙ্গীকারপত্র সংবিধান চালু হবার আগে করা হয়েছিল বা

প্রয়োগ করা হয়েছিল, অথচ নতুন সংবিধান চালু হবার পরেও তা কার্যকর আছে, সেইসব ক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না। আবার উল্লেখিত ওইসব বিষয়গুলির ব্যাপারে যদি এও বলা থাকে যে, সুপ্রিমকোর্ট এইসব বিরোধের ক্ষেত্র পর্যন্ত এলাকা সম্প্রসারণ করতে পারবে না, তাহলে সেইসব বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যদি রাষ্ট্রপতি ওইসব বিরোধের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শ চান, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে বাধ্য।

প্রশ্ন : ১২। *ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত বলা হয় কোন্‌টিকে?*

উত্তর। ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত বলা হয় সুপ্রিমকোর্টকে।

প্রশ্ন : ১৩। *সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) সংবিধানের ব্যাখ্যাবিষয়ক আপিল, (খ) দেওয়ানি আপিল, (গ) ফৌজদারি আপিল এবং (ঘ) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল।

প্রশ্ন : ১৪। *সুপ্রিমকোর্টের সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আপিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যদি কোনো হাইকোর্ট দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য যে-কোনো মামলার বিষয়ে এইরূপ কোনো সার্টিফিকেট দেয়, যাতে বলা থাকে যে, ওই মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে সেইসব মামলার বিচারের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যাবে। তবে হাইকোর্ট যদি বিশেষ কোনো ব্যাপারে এইরূপ সার্টিফিকেট দিতে না-চায়, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট নিজেই সে ব্যাপারে আপিলের অনুমতি দিতে পারে।

প্রশ্ন : ১৫। *দেওয়ানি আপিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। হাইকোর্ট যদি এমন কোনো সার্টিফিকেট দেয়, যাতে উল্লেখ থাকে যে, দেওয়ানি মামলাটির সঙ্গে আইনসংগত সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহলে সুপ্রিমকোর্টে তা আপিলযোগ্য হবে। আবার হাইকোর্ট যদি এও মনে করে যে, সুপ্রিমকোর্টে কোনো দেওয়ানি মামলার বিচার করা উচিত, তাহলে সুপ্রিমকোর্টে সেই মামলা সম্পর্কে আপিল করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : ১৬। *সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শদান এলাকা বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। সংবিধানের ১৪৩(১)নং ধারা অনুসারে, আইন বা তথ্য বিষয়ক সার্বিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে অথবা উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহলে সুপ্রিমকোর্টের কাছে তিনি সে সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন।

সংবিধানের ১৪৩(২)নং ধারা অনুসারে, সন্ধি, চুক্তি, সনদ বা অঙ্গীকারপত্র প্রভৃতি যেগুলি সংবিধান চালু হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং এখনও তা কার্যকর আছে, সেইসব বিষয়ে যদি কোনো বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে সে ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ রাষ্ট্রপতি নিতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৭। *মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট কয়টি ও কী-কী লেখ জারি করতে পারে?*

উত্তর। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট পাঁচটি লেখ জারি করতে পারে। এগুলি হল—

(ক) বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, (খ) পরমাদেশ, (গ) প্রতিষেধ, (ঘ) উৎপ্রেষণ, (ঙ) অধিকার-পৃচ্ছা।

প্রশ্ন : ১৮। *সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণ কীভাবে নিযুক্ত হন?*

উত্তর। রাষ্ট্রপতি দ্বারা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্ট ও রাজ্য হাইকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এঁদের নিয়োগ করেন। আবার অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় তিনি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করেন।

প্রশ্ন : ১৯। *সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল উল্লেখ করো।*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ২০। *'Judicial Activism : Trends and Prospect' বইটি কার লেখা?*

উত্তর। *Judicial Activism : Trends and Prospect* বইটি লিখেছেন প্রাক্তন বিচারপতি পি.বি. সাওয়ান্ত।

প্রশ্ন : ২১। *সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে অপসারণ করা যায়?*

উত্তর। অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কোনো প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন। কোনো বিচারপতিকে পদচ্যুত করার সময় সংসদের দুটি কক্ষের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের $\frac{2}{3}$-অংশের ভোটে অপসারণ-বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হতে হবে।

প্রশ্ন : ২২। *সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার দুটি নীতি উল্লেখ করো।*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার দুটি নীতি হল—

(ক) বিচারপতিদের কোনো রায়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংসদে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না বা সে সম্পর্কে আলোচনা করা যায় না।

(খ) সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতি অবসর নেওয়ার পর ভারতের কোনো আদালতে পুনরায় আইনজীবীরূপে কাজ করতে পারেন না।

প্রশ্ন : ২৩। *'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' (Judicial Review) বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যদি কোনো আইন বা আদেশ বা নির্দেশ সংবিধানসম্মত না হয়, তাহলে ওই আইন বা আদেশ বা নির্দেশকে অবৈধ বলে আদালত ঘোষণা করতে পারে। যেসব আইন বা আদেশ বা নির্দেশকে আদালত অবৈধ বলে ঘোষণা করে, সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হয়, অর্থাৎ সেগুলি কার্যকর হয় না। সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতাকেই বলা হয় 'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' বা Judicial Review।

প্রশ্ন : ২৪। *এমন দুটি উদাহরণ দাও, যেখানে সুপ্রিমকোর্ট 'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা' প্রয়োগ করেছিল?*

উত্তর। সুপ্রিমকোর্ট 'বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা'-এর ক্ষমতা (Power of Judicial Review)-দ্বারা বতিল করে দিয়েছিল এমন দুটি বিষয় হল—
(ক) ব্যাংক-জাতীয়করণ আইন (১৯৬৯),
(খ) রাজন্যভাতা বিলোপ-বিষয়ক রাষ্ট্রপতির আদেশ (১৯৭০)।

প্রশ্ন : ২৫। *ভারতে বর্তমানে হাইকোর্টের সংখ্যা কত?*

উত্তর। ভারতে বর্তমানে হাইকোর্টের সংখ্যা ২১টি।

প্রশ্ন : ২৬। *হাইকোর্ট কীভাবে গঠিত হয়?*

উত্তর। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হয়। অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা কত হবে, রাষ্ট্রপতি দ্বারা তা নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন : ২৭। *হাইকোর্টে কখন কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়?*

উত্তর। যদি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন শূন্য হয়ে যায়, অথবা, তিনি যদি অন্য কোনো কারণে নিজের কাজ করতে না-পারেন, তখন ওই রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতিরূপে নিয়োগ করেন।

প্রশ্ন : ২৮। *হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন কে?*

উত্তর। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। এইরূপ নিয়োগের সময় তিনি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ওই রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। আবার অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় তিনি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও ওই রাজ্যের রাজ্যপাল ছাড়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও পরামর্শ করে নিতে পারেন।

প্রশ্ন : ২৯। *হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল কত বছর?*

উত্তর। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে আসীন থাকতে পারেন।

প্রশ্ন : ৩০। *হাইকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে অপসারণ করা যায়?*

উত্তর। অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কোনো প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোনো রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন। হাইকোর্টের কোনো বিচারপতিকে পদচ্যুত করার সময় সংসদের দুটি কক্ষের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের $\frac{2}{3}$-অংশের ভোটে অপসারণ-বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হলে অভিযুক্ত বিচারপতি রাষ্ট্রপতি দ্বারা পদচ্যুত হবেন।